ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা

শ্লোক ১-২

দেবহূতিরুবাচ

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎপারমার্থিকম্ ॥ ১ ॥
যথা সাঙ্খ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎপ্রচক্ষতে ।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরশঃ প্রভো ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **মহৎ-আদীনাম্**—মহত্তত্ত্ব আদির; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পুরুষস্য**—আত্মার; **চ**—এবং; **স্বরূপম্**—স্বভাব; **লক্ষ্যতে**—বর্ণনা করা হয়; **অমীষাম্**—তাদের; **যেন**—যার দ্বারা; **তৎ-পারম-অর্থিকম্**—তাদের প্রকৃত স্বভাব; **যথা**—যেমন; **সাঙ্খ্যেষু**—সাংখ্য দর্শনে; **কথিতম্**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **যৎ**—যার; **মূলম্**—চরম পরিণতি; **তৎ**—তা; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **ভক্তি-যোগস্য**—ভক্তির; **মে**—আমাকে; **মার্গম্**—পথ; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **বিস্তরশঃ**—বিস্তারিতভাবে; **প্রভো**—হে ভগবান কপিল।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো। আপনি পূর্বে সাংখ্য দর্শন অনুসারে সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং আত্মার লক্ষণ অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি ভক্তির মার্গ আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন, যা সমস্ত দর্শনের চরম পরিণতি।

তাৎপর্য

এই ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং বদ্ধ জীবের উপর কালের প্রভাবও বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধ জীবের উপর কালের প্রভাব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত করা, যা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জড়া প্রকৃতি, আত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন হয়েছে, এবং এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগের তত্ত্ব—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কিত কার্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ হচ্ছে সমস্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব। যে দর্শনের লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি নয়, তা কেবল মনোধর্ম মাত্র; এবং যে ভক্তিযোগের দার্শনিক ভিত্তি নেই, তা ন্যূনাধিক পরিমাণে ভাবপ্রবণতা মাত্র। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত উন্নত এবং তারা কেবল জল্পনা-কল্পনা করে এবং ধ্যান করে, আর অন্যেরা ভাবপ্রবণ এবং তাদের মতবাদের কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। এদের কেউই জীবনের পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারবে না—অথবা, যদি তারা করেও, তাতে তাদের বহু বহু বছর লাগবে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনটি তত্ত্ব রয়েছে—যথা পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং তাঁদের শাশ্বত সম্পর্ক—এবং জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তির তত্ত্ব অনুসরণ করা, এবং চরমে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে পূর্ণ ভক্তি এবং প্রেম সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া।

সাংখ্য দর্শন হচ্ছে সমস্ত অস্তিত্বের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন। মানুষকে সব কিছুর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে জানতে হয়। একে বলা হয় জ্ঞান অর্জন। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য বা জ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত ভক্তিযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞান অর্জন করা উচিত নয়। আমরা যদি ভক্তিযোগ ত্যাগ করে কেবল বস্তুর প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নে ব্যস্ত হই, তা হলে তার ফলে কিছুই লাভ হবে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই প্রকার কার্য ধানের তুষে আঘাতের মতো। তুষে আঘাত করে কোন লাভ হয় না, কেননা তার থেকে শস্য ইতিমধ্যে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। জড়া প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মার বিজ্ঞান-সম্মত অধ্যয়নের সময় বুঝতে হবে যে, তার মূলতত্ত্ব হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্লোক ৩

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্বতো ভবেৎ ।
আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥

বিরাগঃ—বিরক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **ভগবন্**—হে প্রভু; **সর্বতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **ভবেৎ**—হতে পারে; **আচক্ষ্ব**—কৃপা করে বর্ণনা করুন; **জীব-লোকস্য**—জনসাধারণের জন্য; **বিবিধাঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **মম**—আমার জন্য; **সংসৃতীঃ**—সংসার চক্র।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভু। কৃপা করে আমার জন্য এবং জনসাধারণের জন্য, জন্ম-মৃত্যুর নিরন্তর প্রক্রিয়ারও বর্ণনা করুন, কারণ সেই সমস্ত বিপদের কথা শ্রবণ করে, আমরা জড়-জাগতিক কার্য থেকে বিরক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সংসৃতীঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রেয়ঃ-সৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের প্রতি অগ্রসর হওয়ার প্রশস্ত পথ, আবার *সংসৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর পথে সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে অন্তহীন যাত্রা। যাদের এই জগৎ, ভগবান এবং ভগবানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জ্ঞান নেই, তারা প্রকৃত পক্ষে জড় সভ্যতার উন্নতির নামে সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংসারের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মনুষ্যেতর যোনিতে প্রবেশ করা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষেরা জানে না যে, এই জীবনের পর তারা সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হবে, এবং তারা এমন একটি জীবন প্রাপ্ত হবে, যা একেবারেই রুচিসম্মত হবে না। জীব কিভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। জন্ম এবং মৃত্যুর মাধ্যমে নিরন্তর দেহের পরিবর্তনকে বলা হয় সংসার। দেবহূতি তাঁর যশস্বী পুত্র কপিল মুনির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন এই নিরন্তর পরিভ্রমণ বিশ্লেষণ করেন, যাতে বদ্ধ জীবেরা বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম না করার ফলে, তারা অধঃপতনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

শ্লোক ৪

কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাং চ পরস্য তে ।
স্বরূপং বত কুর্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

কালস্য—সময়ের; **ঈশ্বর-রূপস্য**—ভগবানের প্রতিনিধি; **পরেষাম্**—অন্য সকলের; **চ**—এবং; **পরস্য**—মুখ্য; **তে**—আপনার; **স্ব-রূপম্**—প্রকৃতি; **বত**—আহা; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **যৎ-হেতোঃ**—যার প্রভাবে; **কুশলম্**—পুণ্য কর্ম; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

কৃপা করে আপনি শাশ্বত কালেরও বর্ণনা করুন, যা আপনারই স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যার প্রভাবে জনসাধারণ পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের পথ এবং অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারের পথ সম্বন্ধে মানুষ যতই অজ্ঞান হোক না কেন, সকলেই শাশ্বত কালের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত, যা আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক কর্মের ফলকে গ্রাস করে। এক বিশেষ সময়ে দেহের জন্ম হয়, এবং তখন থেকেই তার উপর কাল তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। দেহের জন্মের ক্ষণ থেকে মৃত্যুর প্রভাবও কার্য করতে থাকে; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর কালের প্রভাবও বাড়তে থাকে। কারও বয়স যদি ত্রিশ বছর অথবা পঞ্চাশ বছর হয়, তা হলে কাল তার আয়ুর ত্রিশ অথবা পঞ্চাশ বছর গ্রাস করে ফেলেছে।

জীবনের অন্তিম অবস্থা সম্বন্ধে সকলেই অবগত, যখন মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্তে তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। কিছু মানুষ তাদের আয়ু এবং পরিস্থিতির কথা বিচার করে, কালের প্রভাবে চিন্তিত হয়ে পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোন নিম্ন পরিবারে বা পশুযোনিতে তাদের জন্ম গ্রহণ না করতে হয়। সাধারণত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আসক্ত, তাই তারা স্বর্গলোকে যেতে চায়। সেই জন্য তারা দান আদি পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা বলা হয়েছে, উচ্চতর লোকে এমন কি ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না, কেননা কালের প্রভাব এই জড় জগতের সর্বত্রই উপস্থিত। কিন্তু চিৎ-জগতে কালের কোন প্রভাব নেই।

শ্লোক ৫

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে ।
শ্রান্তস্য কর্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

লোকস্য—জীবের; মিথ্যা-অভিমতেঃ—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; অচক্ষুষঃ—অন্ধ; চিরম্—দীর্ঘ কাল পর্যন্ত; প্রসুপ্তস্য—নিদ্রিত; তমসি—অন্ধকারে; অনাশ্রয়ে—আশ্রয়হীন; শ্রান্তস্য—পরিশ্রান্ত; কর্মসু—জড়-জাগতিক কর্মে; অনুবিদ্ধয়া—আসক্ত; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; ত্বম্—আপনি; আবিরাসীঃ—আবির্ভূত হয়েছেন; কিল—প্রকৃত পক্ষে; যোগ—যোগ-পদ্ধতির; ভাস্করঃ—সূর্য।

অনুবাদ

হে ভগবন্! আপনি সূর্যের মতো, কারণ আপনি জীবের অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবনকে আলোকিত করেন। যেহেতু তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়নি, তাই আপনার আশ্রয় ব্যতীত তারা সেই অন্ধকারে তারা চিরনিদ্রিত, এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কর্মে অনর্থক ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের মহীয়সী মাতা শ্রীমতী দেবহূতিকে জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃতিপরায়ণ এবং মায়ার অন্ধকারে নিদ্রিত মানুষদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ বলে মনে হয়। বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক ভাবনা হচ্ছে তাদের জাগরিত করা। তেমনই দেবহূতি তাঁর যশস্বী পুত্রের কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন বদ্ধ জীবেদের জীবন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন, যাতে তাদের শোচনীয় বদ্ধ অবস্থার সমাপ্তি হয়। ভগবানকে এখানে *যোগভাস্কর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগ-পদ্ধতির সূর্য-সদৃশ। দেবহূতি ইতিপূর্বেই তাঁর মহিমান্বিত পুত্রকে অনুরোধ করেছেন ভক্তিযোগের বর্ণনা করতে, এবং ভগবান চরম যোগ-পদ্ধতিরূপে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন।

ভক্তিযোগ বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য সূর্য-সদৃশ জ্যোতির্ময়। বদ্ধ জীবেদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের নিজেদের

হিত দর্শন করার জন্য চক্ষু নেই। তারা জানে না যে, ভৌতিক আবশ্যকতাগুলি বৃদ্ধি করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কারণ দেহটির অস্তিত্ব মাত্র কয়েক বছর। কিন্তু জীব নিত্য, এবং তাদের আবশ্যকতাগুলিও নিত্য। কেউ যদি জীবনের নিত্য আবশ্যকতাগুলি অবহেলা করে, দেহের আবশ্যকতাগুলিই পূরণ করার কাজে ব্যস্ত হয়, তা হলে সে এমন একটি সভ্যতার অংশগ্রহণকারী, যা জীবকে অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত করে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে নিদ্রিত থেকে, সে কোন রকম আনন্দ পায় না, পক্ষান্তরে সে অধিক থেকে অধিকতরভাবে পরিশ্রান্ত হয়। তার এই শ্রান্তিজনক অবস্থা দূর করার জন্য, সে নানা রকম পন্থা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে সে বিভ্রান্ত হয়। জীবন সংগ্রামের এই শ্রান্তি দূর করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা বা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ ।
আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দিতঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **বচঃ**—বাক্য; **শ্লক্ষ্ণম্**—সুন্দর; **প্রতিনন্দ্য**—অভিনন্দন করে; **মহা-মুনিঃ**—মহর্ষি কপিলদেব; **আবভাষে**—বলেছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **তাম্**—তাঁকে; **করুণা**—করুণা; **আর্দিতঃ**—বিগলিত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনি কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাতার এই সুন্দর বাক্য শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, করুণা বিগলিত চিত্তে সেই বাক্যের অভিনন্দন করে, তাঁর মাতাকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাতার অনুরোধে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি কেবল তাঁর নিজের মুক্তির কথা চিন্তা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি সমস্ত বদ্ধ জীবের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছিলেন। ভগবান সর্বদাই এই জড় জগতের

অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপালু, এবং তাই তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি স্বয়ং এখানে আসেন অথবা তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের পাঠান। যেহেতু তিনি নিরন্তর তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই তাঁর ভক্তেরা যখন তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হন, তখন তিনি তাঁর সেই ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধারের জন্য *ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত—সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার বাণী যাঁরা প্রচার করেন, তখন তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। তাই ভগবান যখন দেখলেন, তাঁর মাতা বদ্ধ জীবেদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ, তখন তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তিনিও অত্যন্ত সদয় হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীভগবানুবাচ

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে ।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রী-ভগবান্-উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **বহু-বিধঃ**—অনেক প্রকার; **মার্গৈঃ**—পন্থায়; **ভামিনি**—হে মহদাশয়া; **ভাব্যতে**—প্রকাশিত; **স্ব-ভাব**—স্বভাব; **গুণ**—গুণ; **মার্গেণ**—ব্যবহার অনুসারে; **পুংসাম্**—সম্পাদনকারীর; **ভাবঃ**—অভিপ্রায়; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়।

অনুবাদ

শ্রীভগবান কপিলদেব উত্তর দিলেন—হে মহদাশয়া। অনুষ্ঠানকারীর বিভিন্ন গুণ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনেক পন্থা রয়েছে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত শুদ্ধ ভক্তি কেবল এক, কারণ শুদ্ধ ভক্তিতে ভক্তের ভগবানের কাছে কোন বাসনা চরিতার্থ করার দাবি থাকে না। কিন্তু সাধারণত মানুষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যারা শুদ্ধ নয় তারা চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তির অনুশীলন করে। ভৌতিক পরিস্থিতিতে পীড়িত হয়ে, আর্ত ব্যক্তি তার ক্লেশ অপনোদনের জন্য ভগবানের ভক্ত হয়। অর্থার্থী ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ভগবানের শরণাগত

হয়। আর যারা আর্ত বা অর্থার্থী নয়, তারা পরমতত্ত্বকে জানার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অন্বেষণে ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, এবং তারা ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) তা খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ভক্তিমার্গ অদ্বিতীয়, কিন্তু ভক্তের পরিস্থিতি অনুসারে ভক্তি অনেক প্রকার বলে প্রতীত হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ৮

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা ।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎস তামসঃ ॥ ৮ ॥

অভিসন্ধায়—উদ্দেশ্য নিয়ে; **যঃ**—যে; **হিংসাম্**—হিংসা; **দম্ভম্**—গর্ব; **মাৎসর্যম্**—ঈর্ষা; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **বা**—অথবা; **সংরম্ভী**—ক্রোধী; **ভিন্ন**—পৃথক; **দৃক্**—দৃষ্টিসম্পন্ন; **ভাবম্**—ভক্তি; **ময়ি**—আমার প্রতি; **কুর্যাৎ**—করতে পারে; **সঃ**—সে; **তামসঃ**—তামসিক।

অনুবাদ

ক্রোধী, ভেদদর্শী, হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি করে, তা তামসিক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ, সব চাইতে মহিমান্বিত ধর্ম হচ্ছে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা। শুদ্ধ ভক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে আনন্দ দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে এইটি কোন উদ্দেশ্য নয়; তা হচ্ছে জীবের শুদ্ধ অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় কেউ যখন ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করতে হয়। গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকট প্রতিনিধি, কারণ তিনি গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হন এবং তা প্রদান করেন। *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গীতার জ্ঞান পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তা না হলে তাতে ভেজাল থাকবে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে, সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। কিন্তু কারও উদ্দেশ্য যদি নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন

যে ব্যক্তি ভক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হয় কিন্তু সে তার নিজের ব্যক্তিত্বের গর্বে গর্বিত, এবং অপরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ বা হিংসাপরায়ণ, সে ক্রোধী। সে মনে করে যে, সে হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এইভাবে যে ভক্তি সম্পাদিত হয় তা শুদ্ধ নয়; তা মিশ্র, এবং তা সব চাইতে নিম্ন শ্রেণীর বা তামসঃ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন, যে বৈষ্ণবের চরিত্র ভাল নয়, তার সঙ্গ বর্জন করা উচিত। বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ না হয় এবং তার যদি অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে তিনি সৎ চরিত্রবান সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণব নন। এই প্রকার বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যেতে পারে, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যে বৈষ্ণব তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার সঙ্গ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৯

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা ।
অর্চাদাবর্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯ ॥

বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অভিসন্ধায়**—উদ্দেশ্যে; **যশঃ**—খ্যাতি; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **বা**—অথবা; **অর্চা-আদৌ**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ইত্যাদি; **অর্চয়েৎ**—আরাধনা করতে পারে; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **পৃথক্-ভাবঃ**—ভেদ ভাব সমন্বিত; **সঃ**—তিনি; **রাজসঃ**—রজোগুণে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বিষয়, যশ এবং ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই ভক্তি রাজসিক।

তাৎপর্য

'ভেদদর্শী' শব্দটি ভালভাবে বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী শ্লোকে এবং এই শ্লোকে সেই সম্বন্ধে *ভিন্নদৃক্* এবং *পৃথগ্‌ভাবঃ* সংস্কৃত শব্দ দুইটির ব্যবহার হয়েছে। ভেদদর্শী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করে। মিশ্র ভক্ত, বা রাজসিক ও তামসিক ভক্ত মনে করে যে, ভগবানের কাজ হচ্ছে তাঁর ভক্তদের চাহিদা মেটানো। এই প্রকার ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। এইটি হচ্ছে ভিন্নদর্শীর মনোভাব। প্রকৃত পক্ষে, শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের মন এবং ভক্তের মন এক হয়ে যাওয়া উচিত। ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন বাসনা থাকা উচিত নয়। সেইটি হচ্ছে একাত্মতা। যখন ভক্তের স্বার্থ বা ইচ্ছা ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন, সেইটি হচ্ছে ভিন্নদর্শীর মনোভাব। তথাকথিত ভক্ত যখন ভগবানের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে, জড় সুখভোগের বাসনা করে, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা বা আশীর্বাদ লাভ করে যশস্বী বা ঐশ্বর্যশালী হতে চায়, সেইটি হচ্ছে রাজসিক ভাব।

মায়াবাদীরা কিন্তু এই 'ভিন্নদর্শী' শব্দটির ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা বলে যে, ভগবানের আরাধনা করার সময় নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করা উচিত। এইটি জড়া প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত ভক্তির আর একটি ভেজাল। জীব এবং ভগবান এক হওয়ার ধারণাটি তামসিক। প্রকৃত পক্ষে একত্ব হচ্ছে স্বার্থের ঐক্য। ভগবানের স্বার্থে কর্ম করা ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ সেই ভক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা মিশ্রিত।

শ্লোক ১০

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ ।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম—সকাম কর্ম; **নির্হারম্**—নিজেকে মুক্ত করে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে; **পরস্মিন্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বা**—অথবা; **তৎ-অর্পণম্**—কর্মের ফল অর্পণ করে; **যজেৎ**—আরাধনা করতে পারে; **যষ্টব্যম্**—পূজা করার জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **পৃথক্-ভাবঃ**—ভিন্নদর্শী; **সঃ**—তিনি; **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণে স্থিত।

অনুবাদ

ভক্ত যখন সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন, এবং তাঁর কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তখন তাঁর ভক্তি সাত্ত্বিক।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ, ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ, এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই আটটি বিভাগের বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম রয়েছে। যখন সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন হয় এবং তার ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় *কর্মার্পণম্*, বা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্মের অনুষ্ঠান। কর্ম সম্পাদনে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তা হলে ভগবানকে নিবেদন করার ফলে তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু কর্মার্পণের এই পন্থা সাত্ত্বিক ভক্তি, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি নয়; কারণ এখানেও স্বার্থ ভিন্ন। চতুরাশ্রম এবং চতুর্বর্ণ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসারে, কোন না কোন লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে। তাই এই সমস্ত কর্ম সাত্ত্বিক; তাদের শুদ্ধ ভক্তির স্তরে গণনা করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, তা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। ব্যক্তিগত বা জাগতিক স্বার্থের কোন অজুহাত তাতে থাকতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের অতীত হওয়া উচিত। শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত জড় গুণের অতীত।

তম, রজ এবং সত্ত্বগুণের ভক্তিকে একাশিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন—এই নবধা ভক্তির প্রতিটি অঙ্গকে তিন-তিনটি গুণাত্মক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শ্রবণ তমোগুণে, রজোগুণে এবং সত্ত্বগুণে হতে পারে। তেমনই, কীর্তনও তম, রজ এবং সত্ত্বগুণে হতে পারে, ইত্যাদি। তিনকে নয় দিয়ে গুণ করার ফল সাতাশ, এবং তাকে পুনরায় তিন দিয়ে গুণ করলে একাশি হয়। শুদ্ধ ভক্তির স্তরে পৌঁছাবার জন্য এই সমস্ত মিশ্র প্রাকৃত ভক্তি অতিক্রম করতে হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১১-১২

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

মৎ—আমার; **গুণ**—গুণ; **শ্রুতি**—শ্রবণের দ্বারা; **মাত্রেণ**—মাত্র; **ময়ি**—আমার প্রতি; **সর্ব-গুহা-আশয়ে**—সকলের হৃদয়ে নিবাসী; **মনঃ-গতিঃ**—হৃদয়ের গতি; **অবিচ্ছিন্না**—নিরন্তর; **যথা**—যেমন; **গঙ্গা**—গঙ্গার; **অম্ভসঃ**—জলের; **অম্বুধৌ**—সমুদ্রের প্রতি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **নির্গুণস্য**—বিশুদ্ধ; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **উদাহৃতম্**—প্রদর্শিত হয়; **অহৈতুকী**—হেতু-রহিত; **অব্যবহিতা**—নিরবচ্ছিন্ন; **যা**—যা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **পুরুষ-উত্তমে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, সকলের হৃদয়ে নিবাসকারী ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী এবং অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের উদয় হয়, তাই হচ্ছে নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ। গঙ্গার জল যেমন স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত হয়, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক ভক্তিও ঠিক তেমনভাবে ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হয়।

তাৎপর্য

এই নির্গুণ শুদ্ধ ভক্তির মূল তত্ত্ব হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। *মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই'। এই গুণগুলিকে বলা হয় *নির্গুণ*। পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না; তাই তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে আকর্ষণীয়। এই প্রকার আকর্ষণ লাভ করার জন্য ধ্যানের অভ্যাস করার কোন প্রয়োজন নেই; শুদ্ধ ভক্ত ইতিমধ্যেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, এবং শুদ্ধ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে আকর্ষণ তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সমুদ্রের প্রতি গঙ্গার জলের প্রবাহের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। গঙ্গা জলের প্রবাহ কোন অবস্থাতেই রোধ করা যায় না, তেমনই ভগবানের দিব্য নাম, রূপ এবং লীলার প্রতি শুদ্ধ ভক্তের যে-আকর্ষণ, তা কোন ভৌতিক অবস্থার দ্বারা রোধ করা যায় না। এই সম্পর্কে *অবিচ্ছিন্না* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুদ্ধ ভক্তের ভক্তি প্রবাহ কোন ভৌতিক পরিস্থিতি রোধ করতে পারে না।

অহৈতুকী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কোন কারণ ছাড়া'। শুদ্ধ ভক্ত জড়-জাগতিক অথবা পারমার্থিক কোন উদ্দেশ্য বা লাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করেন না। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির প্রথম লক্ষণ। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*—তাঁর কোন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন না। এই ভক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবান *পুরুষোত্তম্*-এর উদ্দেশ্যে—অন্য কারও উদ্দেশ্যে নয়। কখনও কখনও মিছা ভক্তেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিকে পরমেশ্বর ভগবানের

বিগ্রহের সমান বলে মনে করে, বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবান, নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই আচরণীয়, অন্য আর কারও উদ্দেশ্যে নয়।

অব্যবহিতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিরামহীনভাবে'। শুদ্ধ ভক্ত বিরামহীনভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাঁর জীবন এমনই ধাঁচে তিনি গড়ে নিয়েছেন যে, প্রতিটি মিনিটে, প্রতিটি সেকেণ্ডে কোন না কোনভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত। *অব্যবহিতা* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থ একই স্তরের। ভগবানের চিন্ময় ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন স্বার্থ নেই। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এই প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত সেবা চিন্ময় এবং তা কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয় না। এইগুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।

শ্লোক ১৩

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৩ ॥

সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস; **সার্ষ্টি**—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া; **সামীপ্য**—ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা; **সারূপ্য**—ভগবানের মতো শারীরিক রূপ প্রাপ্ত হওয়া; **একত্বম্**—সাযুজ্য; **অপি**—ও; **উত**—এমন কি; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করেন; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎ**—আমার; **সেবনম্**—ভক্তি; **জনাঃ**—শুদ্ধ ভক্তগণ।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য অথবা একত্ব—এই সমস্ত মুক্তির কোনটি গ্রহণ করেন না, এমন কি ভগবান সেইগুলি তাঁদের দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি করতে হয়, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। *শিক্ষাষ্টকে* তিনি ভগবানের কাছে

প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান! আমি আপনার কাছে ধন চাই না, আমি সুন্দর স্ত্রী চাই না, আমি বহু অনুগামী চাই না। আপনার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রার্থনা এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, "জন্ম-জন্মান্তরে", যা ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি কামনা করেন না। যোগী এবং জ্ঞানীরা জন্ম-মৃত্যুর পন্থা নিবৃত্তি সাধন করতে চায়, কিন্তু ভক্ত এই জড় জগতে থেকেও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে সন্তুষ্ট থাকেন।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্ত একত্ব বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না, যা নির্বিশেষবাদী, জ্ঞানী এবং ধ্যানীরা কামনা করেন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া শুদ্ধ ভক্তের কল্পনারও অতীত। কখনও কখনও তিনি ভগবানের সেবা করার জন্য বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে রাজি হতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে তা নরকের থেকেও নিকৃষ্ট। এই প্রকার একত্ব বা ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় কৈবল্য, কিন্তু কৈবল্যজনিত সুখ শুদ্ধ ভক্তের কাছে নারকীয় বলে মনে হয়। ভগবানের সেবা করতে ভক্ত এত আগ্রহী যে, তাঁর কাছে পঞ্চ প্রকার মুক্তিরও কোন গুরুত্ব নেই। কেউ যদি ভগবানের শুদ্ধ প্রেমময়ী ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেছেন।

শুদ্ধ ভক্ত যখন চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন, তখন তিনি চার প্রকার সুযোগ লাভ করেন। তার একটি হচ্ছে *সালোক্য* বা ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস করা। ভগবান তাঁর বিভিন্ন বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, এবং তাদের মধ্যে সর্ব প্রধান হচ্ছে কৃষ্ণলোক। ঠিক যেমন এই জড় জগতে প্রধান লোক হচ্ছে সূর্য, ঠিক তেমনই চিৎ-জগতের মুখ্য লোক হচ্ছে কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোক থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা কেবল চিৎ-জগতেই নয়, জড় জগতেও বিতরিত হয়েছে; তবে তা জড় জগতে জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। চিৎ-জগতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, এবং তার প্রত্যেকটিতে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ভগবান। ভক্ত এই বৈকুণ্ঠলোকের কোন একটিতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বাস করার জন্য উন্নীত হতে পারেন।

সার্ষ্টি মুক্তি হচ্ছে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। *সামীপ্য* মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদ হওয়া। *সারূপ্য* মুক্তিতে ভক্ত ভগবানের দিব্য শরীরের

বিশেষ দু-তিনটি লক্ষণ ব্যতীত, ঠিক ভগবানের মতো রূপ লাভ করেন। যেমন, ভগবানের বক্ষের কেশগুচ্ছ শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা ভগবানকে চেনা যায়।

শুদ্ধ ভক্তকে এই পাঁচ প্রকার মুক্তি দান করা হলেও, তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না, তা হলে অবশ্যই তিনি কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য লালায়িত হন না, যা এই সমস্ত অপ্রাকৃত লাভের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন—"হে ভগবান। আমি দেখেছি যে, আমার পিতা সমস্ত জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সত্ত্বেও, এমন কি স্বর্গের দেবতারাও তাঁর ঐশ্বর্যে ভয়ভীত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিমেষের মধ্যে আপনি তাঁকে সংহার করেছেন, এবং তাঁর সমস্ত জাগতিক সমৃদ্ধির সমাপ্তি হয়েছে।" ভক্তের পক্ষে কোন রকম জাগতিক অথবা পারমার্থিক সমৃদ্ধির বাসনা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি কেবল ভগবানের সেবা করতে চান। সেটিই হচ্ছে তাঁর সর্বোচ্চ সুখ।

শ্লোক ১৪

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **ভক্তি-যোগ**—ভগবদ্ভক্তি; **আখ্যঃ**—নামক; **আত্যন্তিকঃ**—সর্বোচ্চ স্তর; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **যেন**—যার দ্বারা; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **ত্রি-গুণম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **মৎ-ভাবায়**—আমার চিন্ময় স্তর; **উপপদ্যতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি, সেই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে, ভক্ত প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন এবং ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য, যাঁকে নির্বিশেষবাদীদের নেতা বলে মনে করা হয়, তাঁর *ভগবদ্গীতার* ভাষ্যের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড়

সৃষ্টির অতীত; তিনি ছাড়া আর সব কিছুই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত। বৈদিক শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সৃষ্টির পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন; ব্রহ্মা এবং শিবও ছিলেন না। কেবল নারায়ণ, বা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে না; তাই তাঁকে বলা হয় *নির্গুণ*। এখানে কপিলদেবও সেই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করেছেন—যিনি শুদ্ধ ভক্তিতে অবস্থিত, তিনি ভগবানের মতো চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবানের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তাঁকে বলা হয় মুক্ত আত্মা বা *ব্রহ্মভূত* আত্মা। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* হচ্ছে মুক্ত স্তর। *অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি এই দেহ নই।' এই উক্তিটি কেবল তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত, এবং তাই তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত।

এইটি নির্বিশেষবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা যে, মানুষ ভগবানের অথবা ব্রহ্মের যে-কোন কাল্পনিক রূপের পূজা করতে পারে, এবং চরমে সে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে। ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় (ব্রহ্ম) লীন হয়ে যাওয়াও অবশ্যই মুক্তি, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। একত্বও মুক্তি, কিন্তু সেই প্রকার মুক্তি কোন ভক্ত কখনও অঙ্গীকার করেন না, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া মাত্রই গুণগতভাবে একত্ব লাভ হয়। ভক্তের কাছে এই প্রকার গুণগত ঐক্য, যা নির্বিশেষ মুক্তির ফল, তা ইতিমধ্যেই লাভ হয়ে গেছে; তাই তিনি আর ভিন্নভাবে তা লাভ করার চেষ্টা করেন না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্ত গুণগতভাবে ভগবানের সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫

নিষেবিতেনানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা ।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥

নিষেবিতেন—নিষ্পন্ন হয়েছে; **অনিমিত্তেন**—ফলের আসক্তি বিনা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **মহীয়সা**—মহিমাযুক্ত; **ক্রিয়া-যোগেন**—ভক্তিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা; **শস্তেন**—শুভ; **ন**—বিনা; **অতিহিংস্রেণ**—অত্যধিক হিংসা; **নিত্যশঃ**—নিয়মিতভাবে।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা বিনা, স্বধর্ম আচরণ করা, যা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত। অত্যধিক হিংসা না করে, নিয়মিতভাবে ভক্তির কার্য সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে মানুষকে তার বর্ণ অনুসারে স্বধর্ম আচরণ করতে হয়। মানব-সমাজের চারটি বর্ণের মানুষদের ধর্ম *ভগবদ্গীতাতেও* বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কার্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযত করা এবং সরল, শুচি ও বিদ্বান ভক্ত হওয়া। ক্ষত্রিয়দের শাসন করার প্রবৃত্তি রয়েছে, তারা যুদ্ধ করতে ভয় পায় না, এবং তারা দানশীল। বৈশ্যদের কর্তব্য কর্ম হচ্ছে কৃষি, গো-রক্ষা এবং বাণিজ্য। শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর বর্ণের সেবা করা, কারণ তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়।

ভগবদ্গীতার বাণী—*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য* অনুসারে, মানুষ তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। এমন নয় যে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই ভগবানের সেবা করতে পারে আর শূদ্রেরা পারে না। সদ্গুরু বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে, সকলেই তাদের স্বধর্ম আচরণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, তার ধর্ম নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ তার বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবা করতে পারে, এবং ক্ষত্রিয় তার রণকৌশল উপযোগ করে ভগবানের সেবা করতে পারে, ঠিক যেভাবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। অর্জুন ছিলেন যোদ্ধা; বেদান্ত বা অন্য কোন অতি উচ্চ স্তরের চিন্তাশীল গ্রন্থ পাঠ করার সময় তাঁর ছিল না। বৃন্দাবনের গোপ-বালিকারা ছিলেন বৈশ্য, এবং তাঁরা গোরক্ষা এবং কৃষিকার্যে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ মহারাজ এবং তাঁর পার্ষদেরা সকলেই ছিলেন বৈশ্য। তাঁরা একেবারেই শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে এবং তাঁকে সব কিছু নিবেদন করে তাঁর সেবা করেছিলেন। তেমনই, চণ্ডাল বা শূদ্রাধম ব্যক্তিদের কৃষ্ণের সেবা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহর্ষি বিদুরের মাতা শূদ্রাণী ছিল বলে, বিদুরকেও শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের মধ্যে কোন ভেদভাব নেই, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, যাঁরা বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁরা নিঃসন্দেহে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন। যদি কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা বিনা, সকলেরই স্বধর্ম ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তা হলে তা মহিমান্বিত। এই প্রকার প্রেমময়ী সেবা অবশ্যই

অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমাস্পদ, এবং যেভাবেই সম্ভব তাঁর সেবা করা উচিত। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদ হচ্ছে *নাতিহিংস্রেণ* ('যতদূর সম্ভব অহিংস হয়ে অথবা জীবন উৎসর্গ না করে')। ভক্তকে যদি হিংসার আশ্রয় নিতেও হয়, তা হলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন না হয়। কখনও কখনও অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে—"আপনি আমাদের মাংস খেতে নিষেধ করছেন, কিন্তু আপনারা তো শাক-সবজি খাচ্ছেন। সেইটা কি হিংসা নয়?" তার উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ শাক-সবজি খাওয়াও হিংসা, এবং শাকাহারীরাও অন্যান্য জীবেদের প্রতি হিংসা করছে, কারণ শাক-সবজিরও জীবন রয়েছে। অভক্তেরা আহারের জন্য গাভী, পাঁঠা এবং অন্যান্য বহু পশু হত্যা করছে, আর ভক্তেরা, যারা নিরামিষাশী, তারাও হত্যা করছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি জীবকেই জীবন ধারণের জন্য অন্য জীবকে হত্যা করতে হয়; সেইটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। *জীবো জীবস্য জীবনম্*—একটি জীব অন্য আর একটি জীবের জীবন। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হিংসা করা।

ভগবানকে অনিবেদিত বস্তু মানুষের আহার করা উচিত নয়। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ*—যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য আহার করার ফলে, মানুষ সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্ত তাই কেবল ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্ত যখন ভক্তিপূর্বক বনস্পতি জগৎ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী তাঁকে অর্পণ করেন, তখন তিনি তা আহার করেন। শ্রীকৃষ্ণকে শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার নিবেদন করতে হয়। ভগবান যদি আমিষ আহার চাইতেন, তা হলে ভক্ত তাঁকে তাই নিবেদন করতেন। কিন্তু ভগবান তা করার আদেশ দেননি।

আমাদের হিংসা করতে হয়, সেইটি প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু অত্যধিক হিংসা করা উচিত নয়। কেবল ততটুকুই করা উচিত, যা ভগবান আদেশ দিয়েছেন। অর্জুন সংহার কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং হত্যা করা যদিও হিংসা, তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শত্রুদের হত্যা করেছিলেন। তেমনই, আমাদের যদি ভগবানের আদেশে হিংসা করতে হয়, তা হলে কেবল যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র হিংসা করা উচিত। তাকে বলা হয় *নাতিহিংসা*। আমরা হিংসা এড়াতে পারি না, কেননা আমরা বদ্ধ জীবনে পতিত হয়েছি, যেখানে আমরা হিংসা করতে বাধ্য হই, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের অতিরিক্ত হিংসা আচরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥

মৎ—আমার; **ধিষ্ণ্য**—মূর্তি; **দর্শন**—দর্শন; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **পূজা**—পূজা; **স্তুতি**—প্রার্থনা; **অভিবন্দনৈঃ**—প্রণতি নিবেদনের দ্বারা; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **মৎ**—আমার; **ভাবনয়া**—ভাবনা সহকারে; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **অসঙ্গমেন**—অনাসক্তি সহকারে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে আমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, আমার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা, এবং আমার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তাঁর উচিত সত্ত্বগুণে নিষ্কাম চিত্তে, প্রতিটি জীবকে চিন্ময় ভাব-সমন্বিত বলে দর্শন করা।

তাৎপর্য

মন্দিরে ভগবানের পূজা করা ভক্তের একটি কর্তব্য। নবীন ভক্তদের জন্য তা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু যাঁরা উন্নত ভক্ত, তাঁদেরও মন্দিরের পূজায় অবহেলা করা উচিত নয়। মন্দিরে ভগবানের উপস্থিতি নবীন ভক্ত এবং উন্নত ভক্ত যেভাবে অনুভব করেন, তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবীন ভক্ত মনে করে যে, অর্চা-বিগ্রহ মূল ভগবান থেকে ভিন্ন; সে মনে করে যে, তা হচ্ছে বিগ্রহরূপে ভগবানের প্রতীক। কিন্তু একজন উন্নত ভক্ত মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পরমেশ্বর ভগবান বলেই মনে করেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে মন্দিরে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের কোন পার্থক্য দেখেন না। এইটি ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর 'ভাব' সমন্বিত ভক্তের দর্শন, কিন্তু নবীন ভক্ত দৈনন্দিন কর্তব্যরূপে মন্দিরে ভগবানের পূজা করেন।

মন্দিরে ভগবানের পূজা করা ভক্তের একটি কর্তব্য কর্ম। তিনি নিয়মিতভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যান, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেন এবং ফল, ফুল এবং স্তুতি আদি পূজার সামগ্রী নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভের জন্য, ভক্তের উচিত অন্য জীবেদেরও ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎ স্ফুলিঙ্গরূপে দর্শন করা।

ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা করা। যেহেতু প্রতিটি জীবের, ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, তাই ভক্তের কর্তব্য সমস্ত জীবকে চিন্ময় অস্তিত্বের সম স্তরে দর্শন করতে চেষ্টা করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, শূদ্র, একটি গাভী, হস্তী, কুকুর এবং একজন চণ্ডালকে জ্ঞানবান পণ্ডিত সমান দৃষ্টিতে দর্শন করেন। তিনি দেহকে দর্শন করেন না, যা কেবল একটি বাইরের বসনের মতো। তিনি একজন ব্রাহ্মণের অথবা একটি গাভীর অথবা একটি শূকরের বসন দর্শন করেন না। তিনি ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎস্ফুলিঙ্গ দর্শন করেন। ভক্ত যদি প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন না করে, তা হলে তাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হননি; পক্ষান্তরে, তিনি ভক্তির নিম্নতম স্তরে রয়েছেন। কিন্তু, তিনি ভগবানের বিগ্রহের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ভক্ত যদিও সমস্ত জীবকে চিন্ময় স্তরে দর্শন করেন, তবুও তিনি সকলের সঙ্গ করতে আগ্রহী নন। যেহেতু একটি বাঘ ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে, আমরা তাকে আলিঙ্গন করব। আমাদের কেবল তাঁদেরই সঙ্গ করা উচিত, যাঁদের কৃষ্ণভাবনা বিকশিত হয়েছে।

যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত, তাঁদেরই সঙ্গে আমাদের মৈত্রী স্থাপন করা উচিত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। অন্য সমস্ত জীবেরাও নিঃসন্দেহে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু যেহেতু তাদের চেতনা আচ্ছাদিত এবং তাদের কৃষ্ণভক্তি বিকশিত হয়নি, তাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও যদি কারও চরিত্র ভাল না হয়, তা হলে তার সঙ্গ বর্জন করা উচিত, যদিও একজন বৈষ্ণব বলে তাকে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে। যিনি বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেন, তাঁকেই বৈষ্ণব বলে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এও আশা করা হয় যে, বৈষ্ণবের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি প্রকাশিত হবে।

শ্রীধর স্বামী *সত্ত্বেন* শব্দটির অন্বয় করেছেন *ধৈর্যেণ* শব্দটির দ্বারা। গভীর ধৈর্য সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা কর্তব্য। দুই একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ত্যাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামীও প্রতিপন্ন করেছেন যে, গভীর উৎসাহ, ধৈর্য এবং বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা উচিত; "আমি যেহেতু ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছি, তাই কৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে স্বীকার করবেন,"

এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ধৈর্য অত্যন্ত আবশ্যক। সাফল্য লাভের জন্য আবশ্যক কেবল বিধি অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা।

শ্লোক ১৭

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া ।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥

মহতাম্—মহাত্মাদের; **বহু-মানেন**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **দীনানাম্**—দীনজনদের; **অনুকম্পয়া**—কৃপা; **মৈত্র্যা**—মিত্রতা; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **আত্ম-তুল্যেষু**—সমতুল্য ব্যক্তিদের; **যমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **নিয়মেন**—নিয়মপূর্বক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা এবং আচার্যের আনুগত্য স্বীকার করে পারমার্থিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। *আচার্যোপাসনম্*—আচার্য বা তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর উপাসনা করা উচিত। গুরুদেবকে অবশ্যই কৃষ্ণের থেকে আগত যে গুরু পরম্পরা, তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। গুরুদেবের পূর্বতন পরম্পরায় রয়েছেন তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরুদেবের গুরুদেব, তাঁর গুরুদেব ইত্যাদি, এইভাবে আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি হয়।

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আচার্যদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *গুরুষু নরমতিঃ*। *গুরুষু* মানে 'আচার্যদের,' এবং *নরমতিঃ* মানে 'একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা'। বৈষ্ণবদের বা ভগবদ্ভক্তদের কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা,

আচার্যদের একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা অথবা মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে পাথর, কাঠ অথবা ধাতু দিয়ে তৈরি বলে মনে করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। *নিয়মেন*—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে আচার্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। ভক্তদের দীনজনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া উচিত। এখানে দীন বলতে জড় বিচারে দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়নি। ভক্তির দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত নয়, সে-ই দীন। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ অত্যন্ত ধনী হতে পারে, কিন্তু সে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়, তা হলে তাকে দরিদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে, বহু আচার্য, যেমন রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী প্রতি রাত্রে গাছের নীচে বাস করতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁদের লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা ছিলেন সব চাইতে ধনী ব্যক্তি।

পারমার্থিক জ্ঞানে অভাবগ্রস্ত সেই দীনজনদের কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত করার জন্য, ভক্ত দিব্য জ্ঞান প্রদান করে তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। এইটি ভগবদ্ভক্তদের একটি কর্তব্য। যাঁরা তাঁর সমতুল্য অথবা যাঁদের উপলব্ধি তাঁর মতো, তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা উচিত। ভক্তদের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের উচিত অন্য ভক্তদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা, যার ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার মাধ্যমে, পরস্পরকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারে। একে বলা হয় *ইষ্টগোষ্ঠী*।

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্*—'নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে'। সাধারণত শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা কীর্তন করে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। *পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ* আদি অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, যাতে দুই বা অধিক ভক্তের মধ্যে আলোচনার অসংখ্য বিষয় রয়েছে। মৈত্রী সুদৃঢ় হয় সম রুচি এবং সম উপলব্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় *স্বজাতি*। যাদের চরিত্র উপলব্ধির মানদণ্ডে স্থির নয়, তাদের সঙ্গ করা ভক্তদের উচিত নয়। তারা বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণ ভক্ত হলেও, তাদের চরিত্র যদি ঠিক না হয়, তা হলে তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত। ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা, দৃঢ়তাপূর্বক বিধি-বিধান পালন করা, এবং সম স্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা।

শ্লোক ১৮

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে ।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহঙ্ক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিক—চিন্ময় বিষয়; অনুশ্রবণাৎ—শ্রবণের ফলে; নাম-সঙ্কীর্তনাৎ—ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে; চ—এবং; মে—আমার; আর্জবেন—সরল আচরণের ফলে; আর্য-সঙ্গেন—সাধু ব্যক্তির সঙ্গের ফলে; নিরহঙ্ক্রিয়য়া—অহঙ্কার-রহিত; তথা—এইভাবে।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করা এবং সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাঁর আচরণ সর্বদাই সরল হওয়া উচিত, এবং যদিও তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন এবং সকলের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন, তবুও যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ তাঁর বর্জন করা উচিত।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হলে, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করতে হয়। নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ পালন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইন্দ্রিয় সংযম করতে হলে অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করা উচিত নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনর্থক বাক্যালাপ করা উচিত নয়, এবং উদ্দেশ্য বিনা বিধি-বিধানগুলি পালন করা উচিত নয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য বিধি-বিধানগুলি পালন করা উচিত।

ভগবদ্গীতায় আঠারটি গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সরলতা। দম্ভহীন হওয়া উচিত, অন্যদের কাছ থেকে অনর্থক সম্মানের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, এবং হিংসা করা উচিত নয়। *অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা।* মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সহনশীল এবং সরল হওয়া। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, এবং ইন্দ্রিয় সংযম করা উচিত। সেই সম্বন্ধে এখানে এবং *ভগবদ্গীতায়ও* উল্লেখ করা হয়েছে। পারমার্থিক জীবনে কিভাবে উন্নতি সাধন

করা যায়, সেই সম্বন্ধে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করা উচিত; এই সমস্ত উপদেশ আচার্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত এবং হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *নামসঙ্কীর্তনাচ্চ*—ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে মহামন্ত্র এককভাবে অথবা অন্যদের সঙ্গে সমবেতভাবে কীর্তন করা উচিত। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়রূপে এই মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এখানে আর একটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে *আর্জবেন*, অর্থাৎ 'নিষ্কপটে'। ভক্তের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা করা উচিত নয়। প্রচারকদের অবশ্য কখনও কখনও যথাযথ নির্দেশনার অধীনে ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে ভক্তকে সর্বদাই নিষ্কপট হওয়া উচিত, এবং আধ্যাত্মিক মার্গে যারা অগ্রসর হচ্ছে না, তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। অন্য আর একটি শব্দ হচ্ছে *আর্য*। *আর্য* হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা কৃষ্ণচেতনায় অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে জাগতিক উন্নতিও সাধন করছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আর্য এবং অনার্য অথবা সুর এবং অসুরের পার্থক্য নিরূপিত হয়। যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ বর্জনীয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *অসৎসঙ্গ-ত্যাগ*—যারা অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। অসৎ হচ্ছে তারা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, যারা ভগবানের ভক্ত নয় এবং যারা স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং জড় বিষয় ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

ভক্তের কখনও তাঁর অর্জিত সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে বিনয় এবং সহিষ্ণুতা। তিনি যদিও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত, কিন্তু তিনি সর্বদাই বিনম্রভাবে থাকেন, যেমন কবিরাজ গোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণবেরা তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে, তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হওয়া। ভক্তের গর্বিত হওয়া উচিত নয় অথবা দাম্ভিক হওয়া উচিত নয়। তা হলে তিনি পারমার্থিক জীবনে নিশ্চিতভাবে উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৯ ॥

মৎ-ধর্মণঃ—আমার ভক্তের; গুণৈঃ—গুণসমূহের দ্বারা; এতৈঃ—এই সমস্ত; পরিসংশুদ্ধঃ—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; আশয়ঃ—চেতনা; পুরুষস্য—ব্যক্তির; অঞ্জসা—তৎক্ষণাৎ; অভ্যেতি—সমীপবর্তী হয়; শ্রুত—শ্রবণের দ্বারা; মাত্র—কেবল; গুণম্—গুণ; হি—নিশ্চয়ই; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

কেউ যখন এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত হন এবং তার ফলে তাঁর চেতনা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম এবং আমার দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, আমার প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাৎপর্য

এই উপদেশের প্রারম্ভে, ভগবান তাঁর জননীকে বলেছেন, *মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ*, ভগবানের নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ করা মাত্রই, ভক্ত তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন শাস্ত্রে অনুমোদিত বিধিগুলি অনুশীলন করার ফলে, মানুষ সমস্ত দিব্য গুণাবলীতে পূর্ণরূপে বিভূষিত হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে আমরা কতকগুলি অসৎ গুণ অর্জন করেছি, এবং উপরোক্ত পন্থা অনুসরণ করার ফলে, আমরা সেই কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত দিব্য গুণাবলী বিকশিত করতে হলে, আমাদের এই সমস্ত কলুষিত গুণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

শ্লোক ২০

যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ২০ ॥

যথা—যেমন; বাত—বায়ু; রথঃ—রথ; ঘ্রাণম্—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; আবৃঙ্‌ক্তে—গ্রহণ করে; গন্ধঃ—সুবাস; আশয়াৎ—উৎস থেকে; এবম্—তেমনই; যোগ-রতম্—ভক্তিযোগে যুক্ত; চেতঃ—চেতনা; আত্মানম্—পরমাত্মা; অবিকারি—অপরিবর্তনশীল; যৎ—যা।

অনুবাদ

বায়ুরূপ রথ যেমন গন্ধকে তার উৎপত্তি স্থান থেকে বহন করে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়, তেমনই যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত, তিনি সর্ব ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পুষ্পোদ্যান থেকে সুগন্ধ বহনকারী সমীরণ যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অধিকার করে, তেমনই ভক্তি সম্পৃক্ত চেতনা পরমাত্মারূপে সর্বত্র এবং সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি এই শরীরে বিরাজমান, এবং সেই সঙ্গে অন্য সমস্ত শরীরেও বিরাজমান। যেহেতু ব্যষ্টি আত্মা কেবল কোন একটি বিশেষ শরীরে বর্তমান, তাই অন্য কোন আত্মা যখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে না, তখন তাকে অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান। ব্যষ্টি আত্মাদের মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সকলের শরীরে সমভাবে বিরাজমান থাকার ফলে তিনি *অবিকারি*। ব্যষ্টি আত্মা যখন কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(ভক্ত্যা মামভিজানাতি)*, কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে সম্পৃক্ত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাত্মারূপে অথবা ভগবানরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ২১

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবে; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **অবস্থিতঃ**—স্থিত; **সদা**—সর্বদা; **তম্**—সেই পরমাত্মা; **অবজ্ঞায়**—অনাদর করে; **মাম্**—আমাকে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল ব্যক্তি; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অর্চা**—অর্চা-বিগ্রহের পূজা; **বিড়ম্বনম্**—অনুকরণ।

অনুবাদ

পরমাত্মারূপে আমি প্রতিটি জীবে বিরাজমান। কেউ যদি সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে অবমাননা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

তাৎপর্য

বিশুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় মানুষ সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। অতএব, কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু অন্য জীবেদের কথা

বিবেচনা না করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম অবস্থায় রয়েছেন। যিনি মন্দিরে বিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু অন্যদের সম্মান প্রদর্শন না করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম স্তরের প্রাকৃত ভক্ত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বুঝবার চেষ্টা করা এবং সেই মনোভাব নিয়ে সব কিছুর সেবা করা। সব কিছুর সেবা করা মানে হচ্ছে, কৃষ্ণের সেবায় সব কিছু ব্যবহার করা। কেউ যদি অজ্ঞ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা না জানে, তা হলে উন্নত ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, তাকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তিনি কেবল অন্যান্য জীবেদেরই নয়, সমস্ত বস্তু কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ২২

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্ ।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—যে; **মাম্**—আমাকে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের মধ্যে; **সন্তম্**—উপস্থিত; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—ভগবানকে; **হিত্বা**—উপেক্ষা করে; **অর্চাম্**—বিগ্রহ; **ভজতে**—পূজা করে; **মৌঢ্যাৎ**—অজ্ঞতাবশত; **ভস্মনি**—ভস্মে; **এব**—কেবল; **জুহোতি**—আহুতি নিবেদন করা; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে অবশ্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং তার সেই পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতোই অর্থহীন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার জীবযোনি রয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান ব্যষ্টি আত্মা এবং পরমাত্মারূপে প্রতিটি শরীরে বিরাজমান। যেহেতু জীবাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, সেই সূত্রে ভগবান প্রতিটি শরীরে রয়েছেন, এবং পরমাত্মারূপে, ভগবান সাক্ষীরূপেও বিরাজমান। দুইভাবেই প্রতিটি জীবদেহে ভগবানের উপস্থিতি অনিবার্য। অতএব

যে-সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে, কিন্তু প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করে না, তারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

যদি ভগবানের সর্ব-ব্যাপকতার এই প্রাথমিক জ্ঞান ব্যতীত, কেউ যদি মন্দিরে, গির্জায় অথবা মসজিদে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তা হলে তার সেই সমস্ত অনুষ্ঠান অগ্নিতে ঘি ঢালার পরিবর্তে ভস্মে ঘি ঢালার মতো। মানুষ অগ্নিতে ঘি আহুতি দিয়ে এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্র এবং অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও যদি ভস্মে ঘি ঢালা হয়, তা হলে সেই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন জীবকে অবহেলা করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্তের জানা কর্তব্য যে, প্রতিটি জীবের অন্তরে, তা সে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, এমন কি একটি পিপীলিকাতেও ভগবান উপস্থিত রয়েছেন, এবং তাই প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা উচিত এবং কারও প্রতি কোন প্রকার হিংসা করা উচিত নয়। আধুনিক সভ্য সমাজে নিয়মিতভাবে কসাইখানা অনুমোদন করা হচ্ছে এবং কতকগুলি ধর্মের ভিত্তিতে সেইগুলি সমর্থন করা হচ্ছে। কিন্তু সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতির জ্ঞান ব্যতীত, তথাকথিত যে মানব সভ্যতার উন্নতি, তা পারমার্থিকই হোক অথবা জড়-জাগতিকই হোক, তা তামসিক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৩

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

দ্বিষতঃ—দ্বেষকারী; **পর-কায়ে**—অন্য শরীরের প্রতি; **মাম্**—আমাকে; **মানিনঃ**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **ভিন্ন-দর্শিনঃ**—ভেদদর্শীর; **ভূতেষু**—জীবেদের প্রতি; **বদ্ধ-বৈরস্য**—শত্রু-ভাবাপন্ন ব্যক্তির; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **শান্তিম্**—শান্তি; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিন্তু অন্য জীবেদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি অন্য জীবেদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার ফলে, কখনও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য* ('অন্যদের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন') এবং *দ্বিষতঃ পরকায়ে* ('অন্য শরীরের প্রতি হিংসাপরায়ণ'), এই দুইটি বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি হিংসাপরায়ণ অথবা বৈরী-ভাবাপন্ন, সে কখনও সুখী হতে পারে না। তাই ভক্তের দৃষ্টি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। তাঁর কর্তব্য দেহের উপাধি উপেক্ষা করে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানের স্বীয় অংশকে দর্শন করা। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টি। ভক্ত সর্বদাই জীবের বাহ্য শারীরিক অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন।

এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে, ভগবান সর্বদাই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করতে উৎসুক। ভক্তদের কাছ থেকে আশা করা যায় যে, তাঁরা এই প্রকার বদ্ধ জীবাত্মাদের কাছে ভগবানের বাণী বা ভগবানের বাসনা বহন করে নিয়ে যাবেন এবং তাদের কৃষ্ণভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করবেন। এইভাবে তাঁরা চিন্ময় পারমার্থিক জীবনে উন্নীত হতে পারেন, এবং তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। অবশ্য, মনুষ্যেতর জীবেদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কিন্তু মানব-সমাজে প্রতিটি জীবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব। মনুষ্যেতর জীবেদেরও অন্য উপায়ে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শিবানন্দ সেন তাঁর কুকুরকে প্রসাদ খাইয়ে উদ্ধার করেছিলেন। ভগবানের প্রসাদ বিতরণের ফলে, অজ্ঞ জনসাধারণ এমন কি পশুরা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায়। বস্তুত, শিবানন্দ সেনের সেই কুকুরটি যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে, তখন সে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তকে সমস্ত হিংসা *(জীবহিংসা)* থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভক্ত যেন কখনও কোন জীবের প্রতি হিংসা না করেন। কখনও কখনও প্রশ্ন করা হয়, শাক-সবজিরও যেহেতু প্রাণ রয়েছে, তাই ভক্তেরা যখন শাক-সবজি আহার করে, তার ফলে কি হিংসা হয়? প্রথমত, পাতা, ডাল অথবা ফল কোন গাছ থেকে সংগ্রহ করা হলে, গাছটিকে হত্যা করা হয় না। আর তা ছাড়া, জীবহিংসার অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি জীব যদিও নিত্য, তবুও তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, তাকে বিশেষ শরীর ধারণ করতে হচ্ছে, এইভাবে সে ক্রমশ তার চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার সেই অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। ভক্তকে ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধি যথাযথভাবে পালন করতে হয়, এবং তার

এইটিও জানা কর্তব্য যে, জীব যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার অন্তরে ভগবান বিরাজ করছেন। ভগবানের এই সর্ব ব্যাপকতা উপলব্ধি করা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **উচ্চ-অবচৈঃ**—বিবিধ; **দ্রব্যৈঃ**—সামগ্রী; **ক্রিয়য়া**—ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উৎপন্নয়া**—সম্পন্ন; **অনঘে**—হে নিষ্পাপ জননী; **ন**—না; **এব**—নিশ্চয়ই; **তুষ্যে**—আমি প্রসন্ন হই; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **অর্চায়াম্**—অর্চা-বিগ্রহরূপে; **ভূত-গ্রাম**—অন্য জীবেদের; **অবমানিনঃ**—যারা অশ্রদ্ধাপরায়ণ।

অনুবাদ

হে মাতঃ। যারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা যদি যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, সেই পূজায় আমি প্রসন্ন হই না।

তাৎপর্য

মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করার চৌষট্টিটি উপকরণ রয়েছে। শ্রীবিগ্রহকে অনেক বস্তু অর্পণ করা হয়, তাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং কতকগুলি কম মূল্যবান। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—" আমার ভক্ত যদি আমাকে একটি ছোট ফুল, একটি পাতা, একটু জল অথবা একটি ছোট ফল নিবেদন করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি প্রদর্শন করা; নৈবেদ্য সেখানে গৌণ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তির বিকাশ যদি না হয়, এবং ভক্তি ব্যতীত যদি নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, ফল-ফুল নিবেদন করা হয়, তা হলে সেই নিবেদন ভগবান গ্রহণ করবেন না। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে উৎকোচ দিতে পারি না। তিনি এতই মহান যে, তাঁর কাছে আমাদের উৎকোচের কোন মূল্য নেই। আর তা ছাড়া যেহেতু তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন অভাবও নেই, অতএব তাঁকে আমরা কি নিবেদন করতে পারি? সব কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কেবল তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করতে পারি।

ভগবানের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যিনি জানেন যে, ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে বাস করেন। মন্দিরে ভগবানের পূজার একটি অঙ্গ হচ্ছে প্রসাদ বিতরণ। এমন নয় যে, নিজের ব্যক্তিগত বাসস্থানে অথবা ঘরে মন্দির তৈরি করে ভগবানকে কিছু নিবেদন করে, তার পর সেইগুলি খাওয়া হবে। অবশ্য, ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না জেনে, খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে আহার করার থেকে সেইটি শ্রেয়; যে সমস্ত মানুষ এইভাবে আচরণ করে, তারা ঠিক পশুর মতো। কিন্তু যে ভক্ত ভগবৎ উপলব্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে চান, তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে, ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে উপস্থিত রয়েছেন, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, তাঁকে অন্য সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হতে হবে। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করা, যাঁরা তাঁর সমস্তরে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়া এবং অজ্ঞ জনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া। অজ্ঞ জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে হয় প্রসাদ বিতরণের দ্বারা। যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন, তাঁদের পক্ষে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রকৃত প্রেম এবং ভক্তি ভগবান গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তিকে অনেক মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য উপহার দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তিনি যদি ক্ষুধার্ত না হন, তা হলে তাঁর কাছে এই সমস্ত উপহার সম্পূর্ণ নিরর্থক। তেমনই, আমরা ভগবানকে নানা রকম মূল্যবান উপচার নিবেদন করতে পারি, কিন্তু আমাদের যদি প্রকৃত ভক্তি না থাকে এবং সর্বত্রই ভগবানের উপস্থিতি যদি আমরা সত্য-সত্যই অনুভব না করি, তা হলে আমাদের ভক্তি অপূর্ণ; এই প্রকার অজ্ঞানের স্তরে আমাদের কোন নিবেদন ভগবান গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ২৫

অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অর্চা-আদৌ—অর্চা-বিগ্রহের আরাধনা ইত্যাদি; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমাকে; **স্ব**—তার নিজের; **কর্ম**—নির্দিষ্ট কর্তব্য; **কৃৎ**—অনুষ্ঠান করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **বেদ**—উপলব্ধি করে; **স্ব-হৃদি**—তার নিজের হৃদয়ে; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের হৃদয়ে এবং অন্য সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমার উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, অর্চা-বিগ্রহের পূজা করে যাওয়া উচিত।

তাৎপর্য

এখানে, যারা কেবল তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছেন, তাদেরও ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের, এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত। অর্থাৎ, কেবল নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক এবং অন্য সমস্ত জীবের সম্পর্ক উপলব্ধি করা অবশ্যই কর্তব্য। যদি কেউ তা বুঝতে না পারে, কিন্তু সে যদি যথাযথভাবে তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে কেবল অনর্থক পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

এই শ্লোকে *স্বকর্মকৃৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *স্বকর্মকৃৎ* হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করেন। এমন নয় যে, ভগবানের ভক্ত হলে অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে, নিজের কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্ভক্তির নামে কারোরই অলস হওয়া উচিত নয়। স্বধর্ম অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। *স্বকর্মকৃৎ* মানে হচ্ছে, অবহেলা না করে নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

শ্লোক ২৬

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ২৬ ॥

আত্মনঃ—নিজের; **চ**—এবং; **পরস্য**—অন্যের; **অপি**—ও; **যঃ**—যিনি; **করোতি**—ভেদভাব দর্শন করে; **অন্তরা**—মধ্যে; **উদরম্**—দেহ; **তস্য**—তার; **ভিন্ন-দৃশঃ**—ভেদদর্শী; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুরূপে; **বিদধে**—সম্পাদন করি; **ভয়ম্**—ভয়; **উল্বণম্**—মহা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহা ভয় উৎপন্ন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়; ভক্তের কর্তব্য সর্ব প্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা।

শ্লোক ২৭

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২৭ ॥

অথ—অতএব; **মাম্**—আমাকে; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **ভূত-আত্মানম্**—সমস্ত জীবের আত্মা; **কৃত-আলয়ম্**—নিবাসকারী; **অর্হয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **দান-মানাভ্যাম্**—দান এবং সম্মানের দ্বারা; **মৈত্র্যা**—মিত্রতার দ্বারা; **অভিন্নেন**—সমান; **চক্ষুষা**—দর্শনের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব, দান, সম্মান এবং মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান আমার পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই জীবাত্মা পরমাত্মার সমান হয়ে গেছে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সমতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাটি মায়াবাদীরা সৃষ্টি করেছে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যষ্টি আত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে উপলব্ধি করা উচিত। ব্যষ্টি আত্মার পূজা করার বিধি এখানে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাকে উপহার দান করে অথবা ভেদভাব-রহিত হয়ে, তাঁর সঙ্গে মিত্রতামূলক আচরণ করা উচিত। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও দারিদ্রগ্রস্ত জীবাত্মাকে *দরিদ্র-নারায়ণ* বলে মনে করে, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ দরিদ্র হয়ে গেছেন। এইটি বিরোধার্থক। পরমেশ্বর

ভগবান সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ। তিনি একটি দরিদ্র আত্মা এমন কি একটি পশুর সঙ্গেও থাকতে সম্মত হতে পারেন, কিন্তু তার ফলে তিনি দরিদ্র হয়ে যান না।

এখানে দুইটি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*মান* এবং *দান*। *মান* শ্রেষ্ঠকে ইঙ্গিত করে, আর *দান* করা হয় নিকৃষ্টকে। আমরা ভগবানকে এমন একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করতে পারি না, যিনি আমাদের দানের উপর নির্ভরশীল। আমরা তাদেরই দান করি, যারা জাগতিক অথবা আর্থিক অবস্থায় আমাদের থেকে নিকৃষ্ট। কোন ধনী ব্যক্তিকে দান দেওয়া যায় না। তেমনই, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *মান*, অর্থাৎ সম্মান উৎকৃষ্টকে দেওয়া উচিত, এবং *দান* নিকৃষ্টকে দেওয়া উচিত। জীব তার কর্মফল অনুসারে ধনী অথবা নির্ধন হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান অপরিবর্তনীয়; তিনি সর্বদাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আচরণ করা উচিত। দয়া এবং মৈত্রীর অর্থ এই নয় যে, ভ্রান্তভাবে কাউকে পরমেশ্বর ভগবানের উচ্চপদে উন্নীত করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের ভ্রান্তিবশত এও মনে করা উচিত নয় যে, একটি শূকরের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা এবং একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ভিন্ন। সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সর্ব শক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি যে-কোন স্থানে থাকতে পারেন, এবং তিনি সর্বত্রই বৈকুণ্ঠ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন। সেইটি হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। তাই, নারায়ণ যখন একটি শূকরের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তখন তিনি একজন শূকর নারায়ণ হয়ে যান না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই নারায়ণ এবং শূকরের শরীরের দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ২৮

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে ।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জীবাঃ—জীব; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অজীবানাম্**—অচেতন পদার্থ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **প্রাণ-ভৃতঃ**—প্রাণের লক্ষণ-সমন্বিত; **শুভে**—হে কল্যাণী মাতা; **ততঃ**—তাদের থেকে; **স-চিত্তাঃ**—বিকশিত চেতনা-সমন্বিত জীব; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ**—যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি রয়েছে।

অনুবাদ

হে কল্যাণী মাতা! অচেতন পদার্থ থেকে জীব শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের মধ্যে যারা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের চেতনা বিকশিত হয়েছে, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবকে দান এবং মৈত্রী ভাবের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, এবং এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিভিন্ন স্তরের জীবের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কখন দান করা উচিত এবং কখন মিত্রতামূলক আচরণ করা উচিত। যেমন, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ—বাঘ একটি জীব, এবং পরমেশ্বর ভগবান সেই বাঘের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, একটি বাঘের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে? অবশ্যই নয়। তাকে প্রসাদ দান করে, তার সঙ্গে ভিন্নভাবে আমাদের আচরণ করতে হবে। বনে অনেক সাধু রয়েছেন, যাঁরা বাঘের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেন না, কিন্তু তাঁরা তাদের প্রসাদ দেন। বাঘেরা আসে এবং প্রসাদ গ্রহণ করে চলে যায়, ঠিক একটি কুকুরের মতো। বৈদিক প্রথা অনুসারে কুকুরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যেহেতু তারা নোংরা, তাই কুকুর এবং বিড়ালদের ভদ্র মানুষের গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ালু গৃহস্বামী কুকুর এবং বিড়ালদের প্রসাদ দেন এবং তারা বাইরে থেকে তা খেয়ে চলে যায়। নিম্ন স্তরের জীবেদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্য মানুষদের সঙ্গে আমরা যেভাবে আচরণ করি, তাদের সঙ্গে ও সেই রকম আচরণ করতে হবে। সমভাব অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আচরণের তারতম্যও থাকবে। আচরণের তারতম্য কিভাবে করতে হবে, তা পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে জীবের স্তরের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থ এবং জীবের মাধ্যমে। কখনও কখনও জীব প্রস্তররূপে প্রকট হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, পাহাড় এবং পর্বত বৃদ্ধি পায়। তার কারণ হচ্ছে সেই প্রস্তরে আত্মার উপস্থিতি। তার থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, জীবনের যে-প্রকাশে চেতনার বিকাশ দেখা যায়, তার পরবর্তী প্রকাশ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ। *মহাভারতের মোক্ষধর্ম*

পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়; তারা দর্শন করতে পারে এবং ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানি যে, গাছেরা দেখতে পায়। কখনও কখনও বিশাল বৃক্ষ তার বৃদ্ধির পথে কোন বাধা এড়াবার জন্য তার গতি পরিবর্তন করে। তার অর্থ হচ্ছে যে, গাছ দেখতে পায়, এবং *মহাভারতের* বর্ণনা অনুসারে, গাছেরা ঘ্রাণও গ্রহণ করতে পারে। তা ইঙ্গিত করে যে, গাছেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে।

শ্লোক ২৯

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র—তাদের মধ্যে; **অপি**—অধিকন্তু; **স্পর্শঃ-বেদিভ্যঃ**—যাদের স্পর্শানুভূতি রয়েছে তাদের থেকে; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **রস-বেদিনঃ**—যারা রস আস্বাদন করতে পারে; **তেভ্যঃ**—তাদের থেকে; **গন্ধ-বিদঃ**—যারা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **শব্দ-বিদঃ**—যারা শব্দ শুনতে পায়; **বরাঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রস আস্বাদন করতে পারে, তারা স্পর্শানুভূতি বিকশিত হয়েছে যে-সমস্ত জীব তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। রস আস্বাদন করতে পারে যে-সমস্ত জীব, তাদের থেকে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে যে-সমস্ত জীব তারা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, ডারউইন সর্ব প্রথম বিবর্তনবাদ প্রবর্তন করেছে, কিন্তু নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান নতুন নয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রচিত *শ্রীমদ্ভাগবতেরও* বহু পূর্বে বিবর্তনের ক্রম-বিকাশের পন্থা মানুষের জানা ছিল। কপিল মুনির বর্ণনায় তার প্রমাণ রয়েছে, যিনি প্রায় সৃষ্টির প্রারম্ভে উপস্থিত ছিলেন। এই জ্ঞান বৈদিক কাল থেকে চলে আসছে, এবং তার বিকাশ-ক্রম বৈদিক সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে; বিবর্তনের ক্রম-বিকাশের মতবাদ বা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান *বেদের* কাছে নতুন নয়।

এখানে বলা হয়েছে যে, গাছেদের মধ্যেও বিবর্তনের প্রক্রিয়া রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার গাছের স্পর্শানুভূতি রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গাছেদের থেকে মাছেরা উন্নত, কারণ মাছেদের রসনেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। মাছেদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভ্রমরেরা, যাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সর্প, যার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে সাপ ব্যাঙের অতি সুন্দর ধ্বনি শুনে তার আহার খুঁজে পায়। সাপ বুঝতে পারে, "এখানে একটি ব্যাঙ রয়েছে," এবং কেবল শব্দ শোনার মাধ্যমে, সে ব্যাঙটিকে গ্রাস করে। যে সমস্ত মানুষ কেবল মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য শব্দ উচ্চারণ করে, তাদের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়। কারও ব্যাঙের মতো শব্দ উচ্চারণকারী সুন্দর জিহ্বা থাকতে পারে, কিন্তু সেই শব্দ তরঙ্গ কেবল মৃত্যুকে আহ্বান করে। জিহ্বা এবং শব্দ-তরঙ্গের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা। তা মানুষকে মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত থেকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ৩০

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥ ৩০ ॥

রূপ-ভেদ—রূপের পার্থক্য; **বিদঃ**—যারা জানে; **তত্র**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তাদের থেকে; **চ**—এবং; **উভয়তঃ**—উভয় চোয়ালে; **দতঃ**—দন্ত-বিশিষ্ট; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **বহু-পদাঃ**—যারা বহু পদ বিশিষ্ট; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **চতুঃ-পাদঃ**—চতুষ্পদ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **দ্বি-পাৎ**—দুই পদ-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রবণক্ষম প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ-বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষ।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কোন কোন পাখি, যেমন কাক রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। পদহীন তৃণ গুল্ম থেকে বোলতার মতো বহু পদ-বিশিষ্ট জীবেরা শ্রেষ্ঠ। বহু পদ-

বিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে চতুষ্পদ প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষেরা, যাদের কেবল দুইটি পা।

শ্লোক ৩১

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—তাদের মধ্যে; **বর্ণাঃ**—বর্ণসমূহ; **চ**—এবং; **চত্বারঃ**—চার; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **উত্তমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ব্রাহ্মণেষু**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে; **অপি**—অধিকন্তু; **বেদ**—বেদ; **জ্ঞঃ**—যিনি জানেন; **হি**—নিশ্চয়ই; **অর্থ**—উদ্দেশ্য; **জ্ঞঃ**—যিনি জানেন; **অভ্যধিকঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে।

অনুবাদ

মানুষদের মধ্যে যে-সমাজ গুণ এবং কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ নামক বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বোত্তম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত তাঁরা সর্বোত্তম।

তাৎপর্য

গুণ এবং কর্ম অনুসারে, মানব-সমাজ যে চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে, তা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের নিয়ে যে বর্ণাশ্রম প্রথা তা দীর্ঘ কাল ধরে প্রচলিত ছিল, কেননা *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতায়* তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথা বিকৃত হয়ে, ভারতবর্ষে তা জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানব-সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিভাগ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন্ শ্রেণী কি করবে তা নিয়ে সব সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যে ব্যক্তি পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ যখন বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তাঁকে বলা হয় বেদজ্ঞ। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্বকে জানা। যিনি পরমতত্ত্বকে তিনটি অবস্থায় যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, এবং যিনি ভগবানকে পরম পুরুষোত্তম বলে জানেন, তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৩২

অর্থজ্ঞাৎসংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকৃৎ ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থ-জ্ঞাৎ—বেদের তাৎপর্যবিৎ থেকে; **সংশয়**—সন্দেহ; **ছেত্তা**—ছেদনকারী; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শ্রেয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **স্ব-কর্ম**—তাঁর নির্ধারিত কর্তব্য; **কৃৎ**—যিনি সম্পন্ন করেন; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **ভূয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **অদোগ্ধা**—নিষ্কাম; **ধর্মম্**—ভক্তি; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের জন্য।

অনুবাদ

বেদ তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ থেকে মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ। স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ থেকে মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি কোন ফলের প্রত্যাশা না করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্যকরূপে বিশ্লেষণাত্মকভাবে পরমতত্ত্বকে অধ্যয়ন করেছেন এবং যিনি জানেন যে, পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। যদি কেউ এই জ্ঞান সম্বন্ধেই কেবল অবগত নন, তিনি পরমতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন, তা হলে তিনি তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। এমনও হতে পারে যে, বিদ্বান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব স্পষ্টভাবে সব কিছুর বিশ্লেষণ করে, সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব-নিয়ম পালন না করেন, তা হলে তিনি উচ্চ পদে আসীন হতে পারেন না। তাঁকে সমস্ত সংশয় দূর করতে সক্ষম হতে হবে এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণযুক্ত হতে হবে। এই প্রকার ব্যক্তি, যিনি সমস্ত বৈদিক নির্দেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ব ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, এবং যিনি তাঁর শিষ্যদের সেই বিধিতে শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য। আচার্যের পদটি হচ্ছে এমনই যে, জীবনের উচ্চতর স্থিতিতে উন্নীত হওয়ার বাসনা-রহিত হয়ে, তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন।

ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থা হচ্ছে বৈষ্ণব। যে বৈষ্ণব পরম তত্ত্ববিজ্ঞান অবগত, কিন্তু তিনি অন্যদের সেই জ্ঞান উপদেশ দিতে পারেন না, তাঁকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারি বৈষ্ণব, যিনি ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান কেবল হৃদয়ঙ্গমই করেননি,

উপরন্তু তা প্রচারও করতে পারেন, তিনি মধ্যম অধিকারি বৈষ্ণব, এবং যিনি কেবল প্রচার করতেই সক্ষম নন, উপরন্তু যিনি সর্বভূতে পরমতত্ত্বকে এবং পরমতত্ত্বে সব কিছুকে দর্শন করেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম অধিকারি বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈষ্ণব ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ; প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন তিনি বৈষ্ণবে পরিণত হন।

শ্লোক ৩৩

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—তাঁর থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **অশেষ**—সমস্ত; **ক্রিয়া**—কর্ম; **অর্থ**—সম্পদ; **আত্মা**—জীবন, আত্মা; **নিরন্তরঃ**—অব্যবহিত; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **আত্মনঃ**—মন; **পুংসঃ**—ব্যক্তির থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **সংন্যস্ত**—অর্পিত; **কর্মণঃ**—যাঁর কর্ম; **ন**—না; **পশ্যামি**—দেখি; **পরম্**—মহত্তর; **ভূতম্**—জীব; **অকর্তুঃ**—কর্তৃত্ব বিনা; **সম**—সমান; **দর্শনাৎ**—যাঁর দৃষ্টি।

অনুবাদ

অতএব আমাকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে যে-ব্যক্তির আকর্ষণ নেই, এবং তাই যিনি তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর জীবন—তাঁর সবকিছু—আমাকে নিবেদন করে, অব্যবহিতভাবে আমার শরণাগত হয়েছেন, সেই প্রকার কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ থেকে কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমদর্শনাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কোন পৃথক স্বার্থ নেই; ভক্তের স্বার্থ এবং ভগবানের স্বার্থ এক। যেমন, ভক্তের ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই দর্শনই প্রচার করেছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আরাধ্য ভগবান, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের স্বার্থ তাঁর স্বার্থ থেকে অভিন্ন।

অজ্ঞতাবশত কখনও কখনও মায়াবাদীরা *সমদর্শনাৎ* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলে যে, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে দর্শন করা। এইটি মহা মূর্খতা। কেউ যখন নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে

রয়েছে, সেখানে সেব্যও রয়েছেন। সেবার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন—সেব্য, সেবক এবং সেবা। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর মন এবং তাঁর আত্মা—সব কিছু—পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অর্পণ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

অকর্তুঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কোন প্রকার কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত।' সকলেই তার কর্মের কর্তা হতে চায়, যাতে সে তার ফলভোগ করতে পারে। কিন্তু ভক্তের এই প্রকার কোন বাসনা থাকে না; তিনি কর্ম করেন কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে দিয়ে কোন বিশেষভাবে কর্ম করাতে চান। তাঁর কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণভক্তি প্রচার করছিলেন, তখন তিনি চাননি যে, লোকে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ বলুক; পক্ষান্তরে, তিনি প্রচার করেছিলেন যে, কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সেই জন্য তাঁর আরাধনা করা উচিত। তিনি ভগবানের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক, তিনি কখনও তাঁর নিজের জন্য কোন কিছু করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সব কিছুই করেন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তাই, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ*—ভক্ত কর্ম করেন, কিন্তু তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। আরও বলা হয়েছে, *ময্যর্পিতাত্মনঃ*—"তিনি তাঁর মন আমাতে অর্পণ করেন।" এইগুলি হচ্ছে ভক্তের গুণ, এবং এই শ্লোক অনুসারে, ভক্তকে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্ ।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এতানি**—এই সমস্ত; **ভূতানি**—জীবেদের; **প্রণমেৎ**—তিনি প্রণতি নিবেদন করেন; **বহু মানয়ন্**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **জীব**—জীবেদের; **কলয়া**—পরমাত্মারূপ অংশের দ্বারা; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

এই প্রকার আদর্শ ভক্ত সমস্ত জীবেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা বা নিয়ন্তারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে আদর্শ ভক্ত ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করেন না, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন, তাই প্রতিটি জীব ভগবান হয়ে গেছেন। এইটি মূর্খতা। কোন মানুষ যখন কোন ঘরে প্রবেশ করে, তখন সেই ঘরটি সেই মানুষে পরিণত হয়ে যায় না। তেমনই, ভগবান চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির প্রতিটিতে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি শরীর ভগবান হয়ে গেছে। কিন্তু, ভগবান বিরাজ করছেন বলে, শুদ্ধ ভক্ত প্রতিটি শরীরকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করেন, এবং ভক্ত যেহেতু পূর্ণজ্ঞানে ভগবানের মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, তিনি প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মায়াবাদীরা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু একটি দরিদ্রের দেহে প্রবেশ করেছেন, তাই পরমেশ্বর ভগবান দরিদ্র-নারায়ণ হয়ে গেছেন। এইগুলি নাস্তিক এবং অভক্তদের অপরাধজনক উক্তি।

শ্লোক ৩৫

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ ।
ময়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

ভক্তি-যোগঃ—ভক্তি; **চ**—এবং; **যোগঃ**—যোগ; **চ**—ও; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **উদীরিতঃ**—বর্ণিত; **ময়োঃ**—যে দুয়ের মধ্যে; **একতরেণ**—যে কোন একটির দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **ব্রজেৎ**—প্রাপ্ত হতে পারেন।

অনুবাদ

হে মাতঃ! হে মনুকন্যা! যে ভক্ত এইভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন করেন, তিনি কেবল ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান কপিলদেব সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তিযোগের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করা উচিত। কেবল কতকগুলি

আসনের অনুশীলন করে এবং নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করে, তৃপ্তি লাভ করা অষ্টাঙ্গ যোগের উদ্দেশ্য নয়। ধ্যানের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। পূর্ববর্তী শ্লোকে যোগীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণতল থেকে পা, হাঁটু, জঙ্ঘা, বক্ষ, কণ্ঠ, একের পর এক এই সমস্ত অঙ্গগুলির ধ্যান করে, ক্রমশ তাঁর মুখমণ্ডল এবং অলঙ্কারে পৌঁছানো। নিরাকারের ধ্যানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এইভাবে সবিস্তারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা যখন ভগবৎ প্রেমের স্তরে আসা যায়, সেইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের স্তর, এবং সেই স্তরে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের প্রতি তাঁর দিব্য প্রেমের প্রভাবে বাস্তবিকভাবে ভগবানের সেবা করেন। যে ব্যক্তি যোগ অভ্যাসের ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি চিন্ময় ধামে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ* —পুরুষ বা জীব পরম পুরুষের কাছে যান। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক; তাঁদের উভয়কেই পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষের গুণ ভগবান এবং জীব উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। *পুরুষ* মানে 'ভোক্তা', এবং ভোগ করার প্রবণতা জীব ও ভগবান উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে, তাঁদের ভোগের মাত্রা সমান নয়। জীব কখনই পরমেশ্বর ভগবানের মতো ভোগ করতে পারে না। সেই সূত্রে একজন ধনী ব্যক্তি এবং একজন গরীব মানুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—তাদের উভয়ের মধ্যেই ভোগ করার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ধনী ব্যক্তিটির মতো দরিদ্র মানুষটি ভোগ করতে পারে না। কিন্তু, দরিদ্র মানুষটি যখন তার ইচ্ছা ধনী ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করেন, এবং যখন তাদের মধ্যে সহযোগিতা হয়, তখন ধনী এবং নির্ধন, অথবা বড় এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তি—উভয়েই সমানভাবে ভোগ করেন। ভক্তিযোগ ঠিক সেই রকম: *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ* —জীব যখন ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন এবং ভগবানকে আনন্দ দান করে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তখন তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা অথবা সমান মাত্রায় উপভোগ করেন।

পক্ষান্তরে, জীব যখন ভগবানের অনুকরণ করে ভোগ করতে চায়, তখন তার সেই ইচ্ছাকে বলা হয় *মায়া*, এবং তা তাকে জড় জগতে নিক্ষেপ করে। যে জীব স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায় এবং ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করে না, সে জড়-জাগতিক জীবনে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখনই সে তার ভোগকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে, তখন সে চিন্ময় জীবনে যুক্ত হয়। এই সূত্রে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি স্বতন্ত্রভাবে জীবনের আনন্দ

উপভোগ করতে পারে না; তাদের পূর্ণ শরীরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। যেমন উদরে খাদ্য দেওয়া হলে, তা সমগ্র শরীরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তা করার ফলে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণ শরীরের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করে। সেইটি হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন, যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন। ভগবানের বিরোধিতা করে জীব কখনও জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; *ভক্তিযোগ* অনুশীলনের দ্বারা তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

এখানে বলা হয়েছে যে, যোগের দ্বারা অথবা ভক্তিযোগের দ্বারা, উভয় পন্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। তা সূচিত করে যে, প্রকৃত পক্ষে যোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তাদের উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু। কিন্তু, আধুনিক যুগে, এক প্রকার যোগ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে শূন্য এবং নিরাকার। প্রকৃত পক্ষে, যোগ মানে হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান। যোগের অনুশীলন যদি প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে বাস্তবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে যোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩৬

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
পরং প্রধানং পুরুষং দৈবং কর্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **পরম্**—চিন্ময়; **প্রধানম্**—মুখ্য; **পুরুষম্**—পুরুষ; **দৈবম্**—চিন্ময়; **কর্ম-বিচেষ্টিতম্**—যাঁর কার্যকলাপ।

অনুবাদ

এই পুরুষ, যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের রূপ। তিনি প্রধান দিব্য পুরুষ, এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়।

তাৎপর্য

যেই পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই পুরুষ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে প্রধান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মার পরম রূপ। যেহেতু

তিনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা প্রকাশের উৎস, তাই এখানে তাঁকে প্রধান পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *কঠোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাম্*—বহু নিত্য জীব রয়েছে, কিন্তু তিনি হচ্ছেন মুখ্য পালক। *ভগবদ্গীতায়ও* তা প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অহং *সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মার প্রকাশ সহ সব কিছুর উৎস।" *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর কার্যকলাপ দিব্য। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*—পরমেশ্বর ভগবানের কর্ম এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব দিব্য; সেইগুলি কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। যিনি সেই তত্ত্ব অবগত—যিনি জানেন যে, ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ সবই জড় কার্যকলাপের অথবা জড় ধারণার অতীত—তিনি মুক্ত। *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ / ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম*—সেই ব্যক্তি তাঁর দেহ ত্যাগের পর, আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে চলে যান। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে, *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ*—কেবল মাত্র ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের কাছে চলে যান।

শ্লোক ৩৭

রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে ।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

রূপ-ভেদ—রূপের পরিবর্তনের; **আস্পদম্**—কারণ; **দিব্যম্**—দিব্য; **কালঃ**—কাল; **ইতি**—এইভাবে; **অভিধীয়তে**—জানা যায়; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **মহৎ-আদীনাম্**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **যতঃ**—যার ফলে; **ভিন্ন-দৃশাম্**—ভিন্নদর্শী; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

বিভিন্ন জড় প্রকাশের রূপান্তর সাধনকারী কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি রূপ। যারা জানে না যে, কাল হচ্ছে সেই একই ভগবান, তারা কালের ভয়ে ভীত হয়।

তাৎপর্য

কালের কার্যকলাপে সকলেই ভীত হয়, কিন্তু যে ভক্ত জানেন, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক বা প্রকাশ, তিনি কালের প্রভাবে একটুও ভয় পান না।

রূপভেদাস্পদম্ বাক্যাংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালের প্রভাবে, কত রূপের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন একটি শিশুর যখন জন্ম হয়, তখন তার রূপ ছোট্ট, কিন্তু কালক্রমে সেই রূপটি একটি বড় রূপে পরিবর্তন হয়—একটি বালকের শরীর, তার পর একটি যুবকের শরীর। তেমনই, কালের প্রভাবে বা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। সাধারণত আমরা একটি শিশুর শরীর, একটি বালকের শরীর, এবং একটি যুবকের শরীরের মধ্যে পার্থক্য দেখি না, কারণ আমরা দেখি যে, কালের প্রভাবে এই পরিবর্তনগুলি হচ্ছে। কাল কিভাবে ক্রিয়া করে তা যারা জানে না, তারাই কালের ভয়ে ভীত হয়।

শ্লোক ৩৮

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ ।
স বিষ্ণাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

যঃ—যিনি; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ভূতানি**—জীবসমূহে; **ভূতৈঃ**—জীবেদের দ্বারা; **অত্তি**—সংহার করেন; **অখিল**—সকলের; **আশ্রয়ঃ**—আধার; **সঃ**—তিনি; **বিষ্ণু**—বিষ্ণু; **আখ্যঃ**—নামক; **অধিযজ্ঞঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **অসৌ**—তা; **কালঃ**—কাল; **কলয়তাম্**—সমস্ত প্রভুদের; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন কাল এবং সমস্ত প্রভুর প্রভু। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনি সকলের আশ্রয়, এবং জীবেদের দ্বারা অন্য সমস্ত জীবেদের সংহার করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন পরম ভোক্তা, এবং অন্য সকলে তাঁর সেবকরূপে কার্য করছেন। যে সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৫/১৪২) বর্ণনা করা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ* — শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরম ঈশ্বর। *আর সব ভৃত্য*—আর অন্য সকলে তাঁর দাস। ব্রহ্মা, শিব, এবং অন্য সমস্ত দেবতারা সকলেই তাঁর ভৃত্য। সেই বিষ্ণু পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, এবং তিনি এক জীব দ্বারা অন্য জীবের সংহারের কারণ।

শ্লোক ৩৯

ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; চ—এবং; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **ন**—না; **দ্বেষ্যঃ**—শত্রু; **ন**—না; চ—এবং; **বান্ধবঃ**—বন্ধু; **আবিশতি**—সমীপবর্তী হয়; **অপ্রমত্তঃ**—সতর্ক; **অসৌ**—তিনি; **প্রমত্তম্**—অসাবধান; **জনম্**—ব্যক্তিদের; **অন্তকৃৎ**—সংহারকারী।

অনুবাদ

কেউই পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় নয় অথবা অপ্রিয় নয়। কেউই তাঁর বন্ধু নয় অথবা শত্রু নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তিনি তাদের সংহার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিস্মৃতিই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। জীব ভগবানের মতো নিত্য, কিন্তু তার বিস্মৃতির ফলে, সে জড়া প্রকৃতিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে। যখন তার দেহের বিনাশ হয়, তখন সে মনে করে যে, তারও বিনাশ হয়। প্রকৃত পক্ষে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃতিই তার এই বিনাশের কারণ। যিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর শাশ্বত সম্পর্কের চেতনা পুনর্জাগরিত করেন, তিনি ভগবানের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান কারোর শত্রু এবং অন্য কারোর বন্ধু। তিনি সকলকেই সাহায্য করেন; যিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন নন, তিনি রক্ষা পান, আর যে মোহাচ্ছন্ন, সে বিনষ্ট হয়। তাই বলা হয়, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সাহায্য ব্যতীত, কেউই সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না। তাই শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেদের রক্ষা করা সমস্ত জীবের কর্তব্য।

শ্লোক ৪০

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

যৎ—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **বাতি**—প্রবাহিত হয়; **বাতঃ**—বায়ু; **অয়ম্**—এই; **সূর্য**—সূর্য; **তপতি**—কিরণ বিকিরণ করে; **যৎ**—যাঁর; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **যৎ**—যাঁর; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **বর্ষতে**—বর্ষণ করে; **দেবঃ**—বৃষ্টির দেবতা; **ভ-গণঃ**—নক্ষত্রসমূহ; **ভাতি**—উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়; **যৎ**—যাঁর; **ভয়াৎ**—ভয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, এবং নক্ষত্রসমূহ দীপ্তি প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে*—"আমার নির্দেশনায় প্রকৃতি কার্য করে।" মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, প্রকৃতি আপনা থেকেই কার্য করে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে এই প্রকার নাস্তিক মতবাদের সমর্থন করা হয়নি। প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করছে। তা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের নির্দেশনায় সূর্য কিরণ বিতরণ করে, এবং মেঘ বারি বর্ষণ করে। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায়।

শ্লোক ৪১

যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যাঁর কারণে; **বনঃ-পতয়ঃ**—বৃক্ষ; **ভীতাঃ**—ভয়ে ভীত; **লতাঃ**—লতাসমূহ; **চ**—এবং; **ওষধিভিঃ**—ওষধিসমূহ; **সহ**—সহ; **স্বে স্বে কালে**—আপন আপন সময় ক্রমে; **অভিগৃহ্ণন্তি**—ধারণ করে; **পুষ্পাণি**—ফুল; **চ**—এবং; **ফলানি**—ফল; **চ**—ও।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বৃক্ষ, লতা, ওষধি এবং মরসুমি গাছেরা আপন আপন সময়ে ফুল এবং ফল ধারণ করে।

তাৎপর্য

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মতো পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায়, নির্দিষ্ট সময়ে ঋতুর পরিবর্তন হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় বৃক্ষ, লতা এবং ওষধি ফুল-ফল ধারণ করে। এমন নয় যে, গাছ-পালা আপনা থেকেই অকারণে বর্ধিত হয়, যা নাস্তিকেরা দাবি করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবানের পরম নির্দেশ অনুসারে তারা বর্ধিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি এত সুন্দরভাবে কার্য করে যে, মনে হয় যেন সব কিছু আপনা থেকেই হচ্ছে।

শ্লোক ৪২

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

স্রবন্তি—প্রবাহিত হয়; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **ভীতাঃ**—ভয়ার্তা; **ন**—না; **উৎসর্পতি**—প্লাবিত হয়; **উদধিঃ**—সমুদ্র; **যতঃ**—যাঁর জন্য; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইন্ধে**—দহন করে; **সগিরিভিঃ**—পর্বতসহ; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ন**—না; **মজ্জতি**—নিমজ্জিত হয়; **যৎ**—যাঁর; **ভয়াৎ**—ভয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, এবং সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। তাঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পর্বত সহ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের জলে নিমজ্জিত হয় না।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ জলে পূর্ণ, যাতে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু শায়িত রয়েছেন। তাঁর নাভি থেকে একটি কমল উত্থিত হয়েছে, এবং সেই কমলের নালে বিভিন্ন ভুবন বিরাজ করছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা বলে, সমস্ত গ্রহগুলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে অথবা অন্য কোন নিয়মের ফলে ভাসছে। কিন্তু প্রকৃত বিধানকর্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমরা যখন নিয়মের কথা বলি, তখন আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, অবশ্যই একজন নিয়ামক রয়েছেন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু তারা আইন প্রণয়নকারীকে চিনতে অক্ষম। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি, সেই আইন প্রবর্তনকারী কে—তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

এখানে বলা হয়েছে যে, গ্রহগুলি নিমজ্জিত হয় না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে বা শক্তিক্রমে ভাসমান রয়েছে, তাই তারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করে রয়েছে যে জল, তাতে পতিত হয় না। প্রতিটি গ্রহ তাদের পর্বত, সাগর, মহাসাগর, নগরী, প্রাসাদ এবং বাড়িঘর নিয়ে অত্যন্ত ভারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভাসছে। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, অন্যান্য যে-সমস্ত গ্রহ মহা শূন্যে ভাসছে, তাতেও এই পৃথিবীর মতো মহাসাগর এবং পর্বত রয়েছে।

শ্লোক ৪৩

নভো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মাদদঃ ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

নভঃ—আকাশ; দদাতি—দেয়; শ্বসতাম্—জীবেদের; পদম্—আবাস; যৎ—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); নিয়মাৎ—নিয়ন্ত্রণাধীন; অদঃ—তা; লোকম্—ব্রহ্মাণ্ড; স্ব-দেহম্—নিজের দেহ; তনুতে—বিস্তার করে; মহান্—মহত্তত্ত্ব; সপ্তভিঃ—সপ্ত আবরণের দ্বারা; আবৃতম্—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে, যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সপ্ত আবরণ সহ বিস্তৃত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, অন্তরীক্ষে সমস্ত গ্রহগুলি ভাসছে, এবং সেই সমস্ত গ্রহে জীব রয়েছে। শ্বসতাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যারা শ্বাস গ্রহণ করে', বা জীবসমূহ। তাদের বসবাসের জন্য অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি গ্রহই অসংখ্য জীবের বাসস্থান, এবং ভগবানের পরম আদেশে আকাশে উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে এও বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিরাট শরীরের বৃদ্ধি হচ্ছে। তা সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যেমন পঞ্চ মহাভূত রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীরকে আচ্ছাদিত করে, সেই সমস্ত উপাদানগুলির আবরণ রয়েছে। প্রথম আবরণটি হচ্ছে মাটির, এবং তা ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের দশ গুণ বড়; দ্বিতীয় আবরণটি হচ্ছে জলের এবং তা পৃথিবীর

আবরণ থেকে দশ গুণ বড়; তৃতীয় আবরণটি আগুনের, যা জলের আবরণ থেকে দশ গুণ বড়। এইভাবে প্রতিটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণ থেকে দশ গুণ বড়।

শ্লোক ৪৪

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ ।
বর্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৪ ॥

গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণ; **অভিমানিনঃ**—নিয়ন্তা; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **সর্গ-আদিষু**—সৃষ্টি আদির ব্যাপারে; **অস্য**—এই জগতের; **যৎ-ভয়াৎ**—যাঁর ভয়ে; **বর্তন্তে**—কার্য করে; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে; **যেষাম্**—যাঁর; **বশে**—অধীনে; **এতৎ**—এই; **চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্তা দেবতাগণ সৃষ্টি, পালন, এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম তিনজন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অধীন। ভগবান বিষ্ণু সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা, ব্রহ্মা রজোগুণের নিয়ন্তা এবং শিব তমোগুণের নিয়ন্তা। তেমনই বায়ু, জল, মেঘ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ বহু দেবতা রয়েছেন। ঠিক যেমন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেমনই, এই জড় জগতে ভগবানের রাষ্ট্রে বহু বিভাগ রয়েছে, এবং সেই সমস্ত বিভাগগুলি ভগবানের ভয়ে যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করে। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ*। নিঃসন্দেহে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানকারী বহু ঈশ্বর রয়েছেন, কিন্তু পরম ঈশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ।

প্রলয় দুই প্রকার। এক প্রকার প্রলয় তখন হয়, যখন ব্রহ্মা তাঁর রাত্রিতে নিদ্রিত হন, এবং অন্তিম প্রলয় হয়, যখন ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, সৃষ্টি, পালন, এবং সংহার কার্য পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৪৫

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—সেই; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **অন্ত-করঃ**—বিনাশ-কর্তা; **কালঃ**—কাল; **অনাদিঃ**—যার আদি নেই; **আদি-কৃৎ**—স্রষ্টা; **অব্যয়ঃ**—অপরিবর্তনীয়; **জনম্**—মানুষদের; **জনেন**—মানুষদের দ্বারা; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **মারয়ন্**—বিনাশ করে; **মৃত্যুনা**—মৃত্যুর দ্বারা; **অন্তকম্**—মৃত্যুর দেবতা।

অনুবাদ

কাল অনাদি এবং অনন্ত। তা কারাগার-সদৃশ এই জড় জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। কাল এই জগতের অন্তক। তা এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে, আবার তেমনই মৃত্যুর দেবতা যমরাজেরও বিনাশ সাধন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পাদন করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি শাশ্বত কালের প্রভাবে পিতা পুত্রের জন্ম দেন, আবার নিষ্ঠুর মৃত্যুর প্রভাবে পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কালের প্রভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দেবতারও মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই জড় জগতে সমস্ত দেবতারাও আমাদের মতোই অনিত্য, আমাদের আয়ু বড় জোর একশ' বছর, তেমনই দেবতাদের আয়ু যদিও কোটি-কোটি বছর, তবুও তাঁরাও নিত্য নয়। এই জড় জগতে কেউই অনন্ত কাল ধরে জীবিত থাকতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গুলি হেলনে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং বিনাশ হয়। তাই ভক্ত এই জড় জগতে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চান। এই সেবার বৃত্তি নিত্য; ভগবান নিত্য, তাঁর ভক্ত নিত্য, এবং সেবাও নিত্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।